শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও বিজ্ঞান

অ ন ন্ত

২৫শে মে ২০০৬

মুক্তমনা'র পঞ্চবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত

ভগবদ্‌গীতা ব্রাহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব ক্ষমতা কাঠামো, শাসন-শোষন, চাতুর্বর্ণ প্রথা টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যদের সুদীর্ঘ সময় ধরে সুকৌশলে রচিত। এটি কোনভাবেই কোন দেবতার মুখঃনিসৃত বাণী নয়। স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্বই যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ। গীতা কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়; নয় কোন আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। হতে পারে, সাহিত্য হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, কিন্তু মানব কল্যানের জন্য, বিজ্ঞানের প্রসারে, জ্ঞানের বিকাশে এঁর বিন্দু মাত্র কোন ভূমিকা নেই।...

অনেকটা হঠাৎ করেই একটি পত্রিকা হাতে আসলো হল আমার, কয়েকদিন আগে। কাগজটি দেখে প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইলেও পত্রিকার প্রথম পাতার মধ্যখানে ঢাউস আকারে ছাপানো একটি খবরে চোখ আটকে গেল। তাই এবার এড়িয়ে না গিয়ে পড়তে বসলাম। খবরটি পড়ার পর আমার কী অনুভূতি হয়েছিল তা এখন উল্লেখ করলাম না, শুধু পত্রিকার খবরটি নীচে একদম হুবহু তুলে ধরলাম :-

জটিল সমস্যা নিরসন করে শ্রীমদ্ভগবদগীতা - আলবার্ট আইনস্টাইন

আলবার্ট আইনস্টাইন কালজয়ী এক নাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইলস্টাইন। বিজ্ঞান জগতে অনেক বিজ্ঞানীর অবদান সময়ের আবর্তে নতুন নতুন আবিস্কারের ফলে হয়তো ধরে রাখতে পারে না তার বিস্ময়। হয়ে পড়ে কিছুটা ম্লান। কিন্তু বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন এর অবদান স্বর্গেও পারিজাত সদৃশ। আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ $E = mc^2$ এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিস্কার এই পৃথিবী গ্রহে নয়। এমনকি ভিন্ন গ্রহে যদি কোন মানুষ বাস করে সেখানেও সৃষ্টি করবে একই বিস্ময়, একই কৌতুহল।

এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার হল আইনস্টাইন ইহুদি বংশোদ্ভুত হয়েও নিয়মিত শ্রী শ্রী গীতা চর্চা করতেন। আরও বিস্ময় এবং মজার ব্যাপার হল যে নিয়মিত গীতা পাঠ এবং গীতা ধ্যানের ফসলই হল আইনস্টাইনের উক্ত দুটি যুগান্তরকারী আবিস্কার।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের শেষ প্রহর। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল ভারত বর্ষে তাদের রাজত্বের মেয়াদ শেষ। তাদেরকে সবকিছু গুটিয়ে অচিরেই ভারত ছেড়ে যেতে হবে। তারা চিন্তা করল যদি ভারত ছাড়তে হয়, তবে ভারত থেকে এমন এক অমূল্য সম্পদ তারা নিয়ে যাবে যার আবেদন বিশ্বজনীন এবং কালজয়ী। বলা বাহুল্য এই কালজয়ী অমূল্য সম্পদ

আর কিছুই নয়, তা হল ইংরেজীতে অনুবাদ করা শ্রী শ্রী গীতা। শ্রীমদভগবত গীতার ইংরেজী অনুবাদে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা নেন চার্লস উইলকিনস যিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কেরানী হিসাবে এদেশে আসেন। উইলকিনস এর এই প্রশংসীয় উদ্যোগের সহায়তা করেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। এখন যদিও প্রায় পঞ্চাশোর্ধ বিদেশী ভাষায় গীতার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। Theory of Relativity লিখে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইনস্টাইন তখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রধান। ভারতের কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আপেক্ষিক তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে যান। বলা বাহুল্য আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিস্কারের পর পৃথিবীতে মাত্র গুটি কয়েক পদার্থবিজ্ঞানী তাহা বুঝতে পেরেছিলেন। আইনস্টাইন আসলেন এবং সকলকে বিস্ময়াভূত করে সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন -

কিংতে নাম ? (তোমাদের নাম কি?)

কথম আগসি ? (কোথা হতে এসেছ)

সাক্ষাৎ প্রার্থী ভারতীয় অধ্যাপকবৃন্দের চক্ষুস্থির, হতবিহবল চিত্তে তারা উত্তর দিল।

We don't know how to speak in Sanskrit. (আমরা সংস্কৃতে কথা বলতে জানি না।) Please speak with us in English. (অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সাথে ইংরেজীতে কথা বলুন।)

আইনস্টাইন ঝড়ের বেগে ক্ষীপ্ত হয়ে বললেন What! you say you are Indians. But you can not speak in Sanskrit. (কি! তোমরা বলছ তোমরা ভারতীয়, কিন্তু সংস্কৃত জান না।)

উত্তরে ভারতীয়রা বলল Sanskrit is a dead language in our country. It is used only in ancestral Functions. (সংস্কৃত হল আমাদের দেশের একটি প্রাণহীন ভাষা। কেবল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ইহা ব্যবহার করা হয়।) আইনস্টাইন তেলে বেগুনে জ্বলে রুদ্র মুর্তি ধারণ করলেন এবং বললেন Who says Sanskrit is the dead language? It is the sole living language in the world. (কে বলে সংস্কৃত প্রাণহীন ভাষা? পৃথিবীতে একমাত্র জীবন্ত ভাষা হল সংস্কৃত।)

তারপর আইনস্টাইনের বক্তব্য নিম্নরূপ :

"আমি ইংরেজীতে অনুবাদ করা গীতা পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যাই, আত্মস্থ হয়ে পড়ি এবং এই আত্মস্থ অবস্থায় পদার্থ বিজ্ঞানের অতিদুর্বোধ্য আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আমার কাছে সূর্যের আলোর মত সহজ সরল হয়ে যায়, সকল জটিল তত্ত্ব হয়ে যায় সরল।"

আইনস্টাইন আরও বলেন - "আমি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাই না। সংস্কৃত অক্ষরে লেখা মূলগ্রন্থ পাঠের জন্য আমি নিজে সংস্কৃত বর্ণমালা, সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ব করি। আমার উপলব্ধি হল "অমৃতং মধুররং সম্যক, সংস্কৃতং হি ততোধিকম॥" যতদিন বিন্ধ্যহিমাচল পর্বত থাকবে দন্ডায়মান, যতদিন গঙ্গা, কাবেরী, গোদাবরী রবে বহমান ততদিন সংস্কৃত থাকবে দীপ্তিমান।"

ভারতীয় পদার্থবিদরা লজ্জায় মাথায় নত করে রইল। অনুধাবন করতে পারল ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা এবং গীতা গ্রন্থ কত প্রভাবশালী এবং সমৃদ্ধ।

- - - - - - - -

যে পত্রিকা থেকে এই চটকদার খবরটি তুলে ধরলাম এটি হল মাসিক "**হরেকৃষ্ণ সমাচার**" (১৪ বর্ষ॥ ৭ম সংখ্যা॥ এপ্রিল ২০০৬ ইং॥ চৈত্র ১৪১২ বৈশাখ ১৪১৩॥ বিষ্ণু - ৫২০॥ ভিক্ষা - ৫ টাকা) আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ -ভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর মুখপত্র। এই মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পত্রিকায় নাম উল্লেখ করা আছে আচার্যঃ শ্রীল অভয়চরণাবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এই পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে লিখিত আছে শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী'র নাম। স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯, ৭৯/১ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০ হইতে প্রকাশিত। ফোন নম্বর - ৭১২২৪৮৮।

কলেজে পড়ার সময় এক স্যার আমাদের একবার বকা দিয়ে বলেছিলেন, যারা গাধাকে ঘোড়া বলে, তারা গাধা চিনে না, ঘোড়াও চিনে না। আর এই পত্রিকার খবরটি পড়ার পর আমার মনে হল, যারা উপাসনাধর্মকে বিজ্ঞান বলে দাবি করেন, তারা উপাসনাধর্ম বোঝেন না, বিজ্ঞানও বোঝেন না। বোঝেন শুধু নিজেদের আখের গোছানো। যাই হোক, এই লেখা পড়ে কয়েকটি প্রশ্ন তক্ষনাৎ মাথায় উদয় হয় - (১) এই লেখার কোন লেখকের নাম উল্লেখ নেই কেন? যদিও অন্যান্য সব লেখায় লেখকের নাম উল্লেখ আছে। (২) এই লেখার কোন তথ্যসুত্র বা উৎস উল্লেখ নেই কেন বা কোথা হতে লেখক এই ধরণের অবিশ্বাস্য তথ্য পেলেন? (৩) যে কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন বলে দাবি করা হচ্ছে তাঁদের নাম কী? এই লেখায় বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখ নেই কেন? (৪) লেখক কী কৌশলে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সুত্র, ভারতীয়রা গীতা'র চর্চা করে বলে বুঝতে পেরেছিলেন; অথচ উনার বক্তব্য মত ভারতীয় পদার্থবিদরা সংস্কৃত ভাষা জানতেন না? এটা কী স্ববিরোধী হয়ে গেল না? (৫) শ্রীমদ্ভগবদগীতা'কে লেখক কী বিজ্ঞানের কোন পুস্তক (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান) হিসেবে ভাবছেন নাকি একে তিনি শুধুই একটি উপাসনাধর্মগ্রন্থ (কোরান, বাইবেল) বলে ভাবছেন নাকি ভাবছেন আবার এই দুটির 'হাঁস-জারু' মার্কা সন্নিবেশ বলে ?

বিজ্ঞান আজ অস্বাভাবিক গতিতে অপ্রতিরুদ্ধ। আর আজকের আধুনিক যুগে উপাসনাধর্মের বাণীগুলো কেমন যেন বোকা-বোকা ধরণের কথাবার্তা। তাই বিজ্ঞানের সাথে উপাসনাধর্মের মেল ঘটাতে না পারলে যে, পাবলিককে গেলানো যাবে না? আর পাবলিক না খেলে যে স্বামীজী, বাবাজী, মাতাজীদের তল্পিতল্পা বেঁধে লাইটপোস্টের নীচে থালা হাতে বসে থাকতে হবে!! তাই বোধহয় এরকম অক্লান্ত সাধু (!) প্রচেষ্টা।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, আমার এই বিষয় নিয়ে লেখার কোন ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু চারিদিকে ইসলামী মৌলবাদ নিয়ে ডামাডোলের ফাঁক দিয়ে কি করে হিন্দু মৌলবাদ বিস্তৃত হচ্ছে, এটা তুলে ধরার জন্যই এই লেখার অবতারণা। ইস্‌কন (**International Society for Krishna Consciousness : ISKCON**) দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে বিশাল আঙ্গিকে হিন্দুউপাসনাধর্মালম্বীদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, অপবৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করে আসছে। যদিও ইসকন-এর কেন্দ্রীয় ওয়েব সাইট থেকে জানা যায় বাংলাদেশের তিনটি অঞ্চলে তাঁদের শাখা রয়েছে। এগুলি হচ্ছে :- (১) **Dhaka**, 5 Chandra Mohon Basak St, Banagram-1203. Tel : +880 (02) 236249 (২) **Chittagong**, Caitanya Cultural Society. Sri Pundarik Dham, Mekhala, Hathzari (mail: GPO Box 877) Tel : +88 (031) 225822 (৩) **Jessore**, Nitai Gaur Mandir, Kathakhali Bazaar, P.O. Panjia Jessore, Bangladesh. Rupa-Sanatana Smriti Tirtha, Ramsara, P.O. Magura Hat। কিন্তু ইসকনের কয়েকজন স্থানীয় সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা গেছে বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বত্রই (যেসব অঞ্চলে হিন্দু মন্দির রয়েছে) তাঁদের

শাখা রয়েছে। তারা ত্রৈমাসিক, মাসিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন ধরনের উপাসনাধর্মীয় বই-পুস্তক, ভাববাদী-পোস্টার, লিফলেট, বিভিন্ন পুঁজার উপকরণ, প্রসাদ ইত্যাদি হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করে আসছেন। এছাড়া নাম-সংকীর্তনের আড়ালে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার চালাচ্ছেন। দেশের অনেক অঞ্চলে আপাত নিরীহ ধরণের মন্দির তৈরি করে গীতা থেকে কৃষে-র প্রেমের (!!) বাণী প্রচার করছেন। তথাকথিত উপাসনাধর্মের শান্তির বাণী প্রচারের নামে আমাদের অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত নিরীহ নিরন্ন মানুষের অজ্ঞতাকে নিয়ে বেওসা করে চলছেন। শুধু ইস্‌কনই নয়, আমাদের দেশে হিন্দুউপাসনাধর্মালম্বীদের মধ্যে রামকৃষ- মিশন, অনুকূল আশ্রম, লোকনাথ আশ্রম ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে অপবৈজ্ঞানিক মৌলবাদী চিন্তা-ধ্যান-ধারণা কৌশলে লোক ঠকিয়ে বিক্রি করতেছেন। এঁদের কাজ কারবার দেখে মনে হচ্ছে মিথ্যার বেসাতির এক মহোৎসব শুরু হয়ে গেছে। এসব দেখার কেউ নেই, কোনো প্রশ্ন করার কেউ নেই, বাধা দেয়ার কেউ নেই।

পবিত্র গীতা নিয়ে কিছু কথা :- প্রায় সব হিন্দুধর্মালম্বীদের বাড়িতে শ্রীমদ্ভগবত গীতা অত্যন্ত যত্নসহকারে পবিত্র ভাবে আলাদা করে তুলে রাখেন। যেমনটি কোরান, বাইবেল-কে যত্নে রাখেন ইসলাম, খ্রিষ্টান উপাসনাধর্মালম্বীরা। অনেক হিন্দু আছেন সকালে ঘুম থেকে উঠে গীতা পাঠ ছাড়া কোনো ধরনের খাদ্য গ্রহন করেন না। গীতাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃতঃ বাণী ভেবে পূণ্যলাভের জন্য যা যা করা দরকার তা তাঁরাই করেন। অন্ধবিশ্বাসী এই সকল হিন্দুদের এই অন্ধ আবেগকে পুঁজি করে বিচিত্র সব নামধারী শতশত বাবাজি, মাতাজি, ঠাকুরজি নিজেদের অন্ন-রুটির যোগান করছেন। স্বর্গলাভের মুলো ঝুলিয়ে নিরন্ন মানুষের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করতে এঁরা এতটুকু কুন্ঠাবোধ করেন না। সৌম্য দর্শন আর সেবা পরায়ণ মুখোশের আড়ালে কী বিভিৎস লাম্পট্য আর ভন্ডামি তাঁদের মধ্যে বিরাজ করছে, তা দেখলে শরীর রি রি করে উঠে!!

শ্রীমদ্ভগবত গীতা-কে ভগবদ গীতা আবার শুধু গীতাও বলে। গীতা'য় মূলত কৌরব আর পান্ডবদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে দেখে যুদ্ধ বিমূখ হয়ে পড়েন।

অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করতে শ্রীকৃষ- অনেক যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেন। এই ধরনের যুক্তি-তর্কে শ্রীকৃষ- যা বলেন তাই গীতার বিষয়বস্তু। গীতায় লক্ষ করা যায় যে, অর্জুন শ্রীকষ্ণকে বিভিন্ন নামে ডাকছেন। যেমন হৃষিকেশ, মধুসূধন, জনার্দন, বার্ষ্ণেয়, গোবিন্দ, অরিসূদন, কেশব ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কিছু বলছেন, তখন বলা হচ্ছে "শ্রীভগবান উবাচ"। একারণেই হয়তো গীতাকে ভগবদগীতা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান দ্বারা যা গীত হয়েছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ২৩-৪০ পরিচ্ছেদের ১৮টি অধ্যায়ে বর্তমানের প্রচলিত গীতা। এই আঠারোটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে সর্বমোট ৭০০টি শ্লোক। (**সিন্ধু থেকে হিন্দু**; পৃষ্ঠা: ৪৪)

গীতার রচয়িতা কে তা অজানা। যেমন জানা যায় না প্রাচীন ভারতের অনেক লোকগাঁথা আর উপাসনাধর্মীয় পুস্তক রচয়িতার নাম। তবে গীতার অনেক ভাষ্যকার রয়েছেন; রয়েছে তাদের সম্পাদিত নানা ধরণের টীকা। বস্তুত টীকা ছাড়া গীতা বোঝা খুবই কঠিন। গীতার নানা ভাষ্যকার যার যার বিশ্বাসমতো গীতার ভাষ্য লিখেছেন ফলে এঁদের টীকা পড়লে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতের চাপে একজন পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। গীতার ভাষ্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শঙ্খরাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধরস্বামী মাধ্বাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমূখ।

গীতাকে অনেক ভাষ্যকাররা (শঙ্খরাচার্য) হিন্দুদের আরেকটি উপাসনাগ্রন্থ "উপনিষদ" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, উপনিষদ বেদান্ত বা বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত, ভগবদ্‌গীতা বুঝি সেই শ্রেণীরই একটি উপনিষদ। তবে বিশেষজ্ঞরা এবং অদ্বৈত অবেদান্ত দর্শনের প্রবক্তরাও গীতাকে উপনিষদ থেকে আলাদা করে দেখেন। তাহলে প্রশ্ন চলে আসে, গীতা কেন উপনিষদ বলা হয়? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে গীতা প্রাচীন উপনিষদের অনেক পরবর্তীকালের রচনা হলেও অনেকের মতে এই গীতা উপনিষদের সার সংগ্রহ বিশেষ। পন্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং দেখিয়েছেন ভগবদ্‌গীতার সঙ্গে অন্তত তেরোটি উপনিষদের কোন না কোন অংশের মিল রয়েছে। আবার ব্রাহ্মণ্যবাদের গুরু স্বামী বিবেকানন্দও এই মত সমর্থন করে বলেছেন- গীতা প্রাচীনতর উপনিষদগুলোর পরবর্তীকালের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য বিশেষ। তাঁর মতে- "The Geeta is a Commentary on the Upanishads...the Geeta takes the idea of the Upanishads and in (some) cases the very words. They are strung together with the idea of bringing out, in a compact, condensed and systematic from, the whole subject the Upanishads deal with." (**সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা**; পৃষ্ঠা- ৩০)। আবার গীতার অনেক শ্লোক এবং বক্তব্যের সংগে বৌদ্ধ উপাসনাধর্মগ্রন্থের বিশেষত "ধম্মপদ" এবং "সুত্তনিপাত"-এর অনেক অংশের সঙ্গে মিল রয়েছে গীতার কিন্তু এসব গ্রন্থে কিংবা অন্য কোন প্রাচীন বৌদ্ধ উপাসনাধর্ম গ্রন্থে গীতার কোন উল্লেখ নেই। যদিও বৌদ্ধ উপাসনাগ্রন্থগুলির সঠিক বয়স নির্ধারণ করা কঠিন তবু মনে করা হয় গ্রন্থগুলি বুদ্ধের সমকালে কিংবা তার অল্প কিছু কাল পরে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বেশ আগেই রচিত।

বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত অনুযায়ী গীতা ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক, পশ্চিমা পন্ডিত গীতাকে আদি মহাভারতের অংগ বলে মনে করেন না, বরং পরবর্তীকালের পল্লবিত মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত সংযোজন বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিলক, ভান্ডাকর, রাধাকৃষ-ণ সহ প্রমুখ ভারতীয়, আর লাসেন, লরিনসার, গারবে, ভ্যান বুইটিনেন প্রমুখ পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ। ভগবদ্‌গীতা আদি মহাভারতে ছিল না, পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে, এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁদের কিছু যুক্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো :-

(১) মহাভারতের উপক্রমণিকার সংক্ষিপ্তসারে অথবা আদিপর্বের প্রথমে দেয়া সংক্ষিপ্তসারে গীতার উল্লেখতো দূরের কথা, কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কোন কথোপকথনেরই উল্লেখ নেই। যদিও অনেক তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ আছে। দুটি সংক্ষিপ্তসারই আদি মহাভারতে গীতা সংযোজিত হবার আগে রচিত হয়েছিল এবং পরে তা আর সংশোধন করা হয়নি, এ অনুমান যুক্তিসম্মত।

(২) উপরোক্ত দুটি সংক্ষিপ্তসারে, অথবা আদিপর্বের সুদীর্ঘ "ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে" কোথাও "কুরুক্ষেত্র" শব্দটিই নেই। মনে হয় একটি বড় লোকগাঁথা মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে কুরুক্ষেত্রের সংগে যুক্ত করা হয়েছিল।

(৩) ভাষা রচনাশৈলীর বিচারে গীতা মূল মহাভারতের চেয়ে আরও বিবর্তিত, অতএব আধুনিক এবং প্রক্ষিপ্ত।

(৫) সাংখ্য দর্শন এবং যোগ দর্শনের বিভিন্ন শাখার সংগে গীতার রচনাকারের পরিচয় ছিল। অথচ এসব দর্শন গড়ে উঠবার আগেই মূল মহাভারত রচিত হয়েছিল। অতএব গীতা পরবর্তীকালের রচনা এবং পল্লবিত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

(৬) মহাভারতের ভীষ্মপর্বে হঠাৎই ভগবদ্‌গীতা আরম্ভ হচ্ছে এবং দীর্ঘকাল পরে শেষ হচ্ছে। যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ অকারণে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। গীতা আরম্ভ হবার আগে দুপক্ষের শংখনাদের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয়ে গেছে। আবার আঠারো পরিচ্ছেদের গীতা শেষ হওয়া মাত্রই যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। এত দীর্ঘ সময় কষ্ণ ও অর্জুন ছাড়া বর্ণিত লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা কি করছিলেন তার কোন ব্যাখ্যা নাই। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা পরম্পরা, রচনাবিন্যাস, ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংলাপ এবং সাহিত্যিকতার বিচারে মহাভারতে গীতা সংক্রান্ত কিছু না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এই সামঞ্জস্যহীনতা কোন মহাকবির কলমে সম্ভব নয় বলে মনে হয়। মহাভারতের অংগ হিসাবে ভগবদ্‌গীতার এই সাহিত্যিক অসংগতিটির দিকটি কবি রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সংগে তুলে ধরছেন। তিনি বলেছেন- "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থামিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহে অপরাধ। যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদগীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই।"

(৭) ভগবদ্‌গীতা শেষ হয়ে যাবার অনেক পরে নবম দিনের যুদ্ধের সময় অর্জুনের আচরণ এবং কষ্ণার্জুন সংলাপ গীতা প্রবচনের সংগে সংগতিবিহীন।

(৮) জার্মান পন্ডিত লাসেন এবং অ্যালব্রেখট্ ওয়েবার, ইংরেজ পন্ডিত মনিয়ের উইলিয়ামস্ সহ অনেক বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, পান্ডবেরা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক কল্পনামাত্র, এবং যে যুদ্ধের কথা প্রাথমিক পর্যায়ের মহাভারতে ছিল তা প্রকৃতপক্ষে কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, কুরু-পান্ডবের নয়। মহাভারতে পান্ডব পক্ষের অস্তিত্ব এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের মুখ্য ভূমিকা পরবর্তী কালের সংযোজন। বঙ্কিমচন্দ্রও পান্ডবদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে মহাভরতের যুদ্ধ প্রধানত কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ। (**সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা**; পৃষ্ঠা: ৩১-৩৩)।

মহাভারতের উপক্রমণিকার বক্তব্য অনুযায়ী ব্যাসদেব মহাভারতের প্রথমে মাত্র চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল, এবং তাতে কোন উপাখ্যান ছিলো না। তারপর ব্যাসদেব নাকি ষাট লক্ষ শ্লোকের এক বিরাট মহাভারত রচনা করেন। এর মধ্যে ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনের লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, আর চৌদ্দ লক্ষ

গন্ধর্বলোকে চলে যায়। বাকী এক লক্ষ পৃথিবীতে রয়ে যায়। এই ধরণের আষাঢ়ে গল্প আগ্রাহ্য করলেও এই দাঁড়ায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের চব্বিশ হাজার শ্লোকের মহাভারত কালক্রমে পল্লবিত হতে হতে একলক্ষ শ্লোকের মহাভারত হয়ে উঠে। অবশ্য আরেকটি মত অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ের আট হাজার শ্লোকের "জয়" নামক একটি একটি কাব্য পরবর্তীকালের চব্বিশ হাজার শ্লোকের "ভারত" নামের মহাকাব্যে পরিণত হয়, এবং আরও পরে এই মহাকাব্য একলক্ষ শ্লোকের মহাভারতে পরিণত হয়। যা হোক, আমরা সে দিকে যাচ্ছি না। সাম্প্রতিক কালের গবেষকরা এ বিষয়ে একমত যে, মহাভারতের মূলকাহিনী লোকমূখে মোটামুটি খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রচলিত থাকলেও আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই প্রথম লিখিত রূপ নেয়। কিন্তু চারশ বছরের মৌখিক পরম্পরাতেই এর কলেবর অনেক বৃদ্ধি পায়। তারপর আনুমানিক খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত, এমনকি তার পরেও, মহাভারত আয়তনে অনেক বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই প্রায় বারোশ বছর ধরে অগণিত লেখকের হস্তক্ষেপে চব্বিশ হাজার শ্লোকের আদি মহাভারত প্রায় একলক্ষ শ্লোকের মহাভারতে পরিণত হয়।

গীতার রচনাকাল সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ মনে করেন গীতা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দি পর্যন্ত। বিদগ্ধ লেখক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন আদি গীতা রচনাকাল এরকম হলেও মহাভারতের অংশ হিসাবে প্রচলিত গীতা আরও পরবর্তীকালের সংযোজন। স্বামী বিবেকানন্দ কৃষ- ও যীশুর প্রচলিত জীবনকথা তথা ভগবদ্‌গীতা ও নিউ টেষ্টামেন্টের মধ্যে অনেক মিলের কথা উল্লেখ করেছেন। রিচার্ড গার্বে মনে করেন যে, গীতা রচিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রাবার্ট মাইনর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ২৫০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা রচিত হয়েছিলো এবং ১৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো। যদিও তার পরেও মহাভারতের সংগে সংগে গীতার আরও পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রয়ের মত অনুযায়ী মহাভারতের অংগ হিসাবে গীতার জন্মলগ্ন নিঃসন্দেহে খ্রিষ্টপরবর্তীকালে। ডি. ডি. কোসামবির মতে "**গীতা জালিয়াতির ফসল**"; গীতার রচনাকাল কোনক্রমেই খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগের আগে হতে পারে না এবং তার পরেই কোন সময়ে গীতা পল্লবিত মহাভারতে সংযোজিত হয়েছিলো। একথাও মনে রাখা দরকার যে, অনেক গবেষক, ঐতিহাসিকের মতে গীতা কোন একক লেখকের রচনা নয়। বর্তমানে প্রচলিত গীতা বহুকালধরে অনেক লেখকের রচনা, পরিবর্তন, এবং পরিবর্ধনের ফসল। রাজারাম শাস্ত্রী ভাগবতের মতে গীতায় প্রথমে শুধু ষাটটি শ্লোক ছিল। পরবর্তীকালে ছয়টি পর্যায়ে ক্রমশ পল্লবিত হয়ে এটি বর্তমান সাতশো শ্লোকের গীতায় রচিত হয়। ফন হামবোলড্ নামে জার্মান গীতা বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে ভগবদ্‌গীতা প্রথমে একাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ছিলো। বাকি সাত পরিচ্ছেদ পরবর্তীতে যোগ করা হয়েছে। আলব্রেখট ওয়েবার, হলষ্টারম্যান, হপকিনস্, জ্যাকবি প্রমুখ পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা এই মতের সমর্থক। জি. এস. খইর নামে একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন পর্যায়ে তিনজন লেখক গীতা রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার (যাঁকে অনেকে গোড়া হিন্দু বলে দাবি করেন) মনে করেন ভগবদ্‌গীতা বেশ কিছু বড় বড় কবি, দার্শনিক এবং ভক্তের রচনার ফসল। ১৯৮৬ সালে মৃত্যুর অল্পকাল আগে অধ্যাপক এ. এল. বেশম এক বক্তৃতামালায় বলেছেন ভগবদ্‌গীতা তিনটি পর্যায়ে তিনজন লেখক দ্বারা রচিত হয়েছিলো। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ৩৮, এই ৮৫টি শ্লোক নিয়ে গীতা রচিত হয়েছিলো। এখানে শুধু ক্ষত্রিয়ধর্মে যুদ্ধ করবার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন বেদান্তবাদী লেখক অদ্বৈত ব্রহ্মের তত্ত্ব যোগ করে গীতার কলেবর অনেক বৃদ্ধি করেন। শেষ পর্যায়ে একজন বিষ্ণু-ভক্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী গীতায় বিষ্ণুর অবতারত্ব সংযোজন করেন, আর বাসুদেব কষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। আশ্বমেধিক পর্বের অনুগীতার সংগে ভীষ্মপর্বের ভগবদ্‌গীতার তুলনা করে বেশম এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অনুগীতা রচনার সময় ভগবদ্‌গীতায় বিষ্ণু অবতারের কোন চিহ্ন ছিল না। উল্লেখ্য

যে, বেশমের অনেক আগে এফ. ও. শ্রেডার নামে একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ মূলত একই মত প্রকাশ করেছিলেন। (**সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা**; পৃষ্ঠা: ৩৬-৩৮।)

উপরের আলোচনা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, **খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ভগবদ্‌গীতা পর্যায়ক্রমে রচিত, পরিবর্ধিত এবং মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছিলো**। আর এই সময়টাই ছিলো মহাভারতে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের যুগ।

গীতার শ্রীভগবান :- গীতাকে হিন্দু-উপাসনাধর্মালম্বীরা ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী হিসেবে সম্মান করে থাকেন, পুঁজো করে থাকেন। আর এই ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ-, যিনি বিষু-র স্বয়ং অবতার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিষু- কে? শ্রদ্ধেয় পাঠক, শ্রীকৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক পুরুষ কি না বা আদৌ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি না, আমি সে দিকে যাচ্ছি না। (মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে নানা সন্দেহ রয়েছে। এ বিষয়ে আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন **মৌলবাদ ও মহাকাব্য; পৃষ্ঠা: ৬৮-১০৮**) আমরা এখন দেখব, শ্রীকৃষ্ণ যদি সত্যই জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবুও তিনি "বিষ্ণু" নামক ভগবানের অবতার হতে পারেন কি না।

ইতিহাসের আদিপর্বে স্বভাবতই বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব ছিল। মানুষ তখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তো, তাদের দৈবশক্তি অর্থাৎ আধিভৌতিক সত্তা হিসেবে কল্পনা করতো। এভাবে আকাশে সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝড়, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতিকে বিভিন্ন দেবদেবী রূপে কল্পনা করতো। তেমনিভাবে পৃথিবীতে অগ্নি, জল, মাটি, পর্বত, নদী, বন প্রভৃতি অনেক প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেই দেব-দেবী'র অধিষ্ঠান কল্পনা করতো। কিন্তু সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর, শক্তিশালী, এবং সর্বব্যাপী সত্তা ছিল সূর্য, আর তার পরেই ছিল চন্দ্র। সূর্যের প্রখরতার জন্য তাকে পুরুষ দেবতা এবং চাঁদের স্নিগ্ধতার জন্য তাকে সাধারণত দেবী হিসেবে কল্পনা করা হতো। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, প্রাচীন মিশরে "রা" এবং গ্রীসে "এপোলো" নামে সূর্যকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে পুঁজা করতেন। ভারতবর্ষেও বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সূর্যকেই প্রধান দেবতা রূপে কল্পনা করা হতো। প্রাচীনকালে গ্রীসে এবং ভারতে অভিজাত শ্রেণী রথে চড়ে যাতায়াত করতেন। তাই এসব দেশে কল্পনা করা হতো যে, আকাশে সূর্য রথে চড়ে যাতায়াত করেন, আর বিভিন্ন দেবতা তার রথের অশ্ব, সারথি ইত্যাদি। আধুনিক যুগেও ভারতে এরকম ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল; কোণারকের সূর্যমন্দির সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য সূর্যমন্দির তার প্রমাণ।

"বিষ্ণু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ (বিষ্ = বিস্তার+নু) যার বিস্তার বা ব্যাপ্তিই পরিচয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবী থেকে আপাতদৃষ্টিতে দেখা আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে সূর্যের আছে একমাত্র এই পরিচয়। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের ২২ সূক্তের ১৬-১৭ঋকে একই সংগে অশ্বীদ্বয়, সবিতা এবং বিষু-র কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এখানে দুটি ঋকে তিনপাদ বিক্ষেপে বিষু-র পৃথিবী পরিক্রমার কথা বলা হয়েছে। নিরুক্ত টীকাকার দুর্গাচার্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "বিষু-রাদিত্যঃ । ....সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন পদমেকং নিধত্তে। বিষু-পদে মধ্যন্দিনেহন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ মন্যতে।" ভাবার্থ হচ্ছে সূর্যই বিষু-, তার উদয়কালীন, মধ্যাহ্নকালীন আর অস্তকালীন এই তিন পাদবিক্ষেপ। বিশেষত মধ্যেদিনে অন্তরীক্ষে অবস্থিতিই সূর্যের বিষু-ত্ব। বিষু-র এই পাদে পৃথিবী পরিক্রমার কথা আরও কয়েকটি সুক্তে আছে। এগুলো হচ্ছে, ঋগ্বেদ ৯/১৫৪/১-৬, ১/১৫৫/৪-৬, ১/৫৬/৫, ১০/৩৭/৮। এছাড়া ঋগবেদ সংহিতার প্রথম মন্ডলের ১৫৫ সূক্তের ৫নং ঋকে বলা হয়েছে যে "মানুষেরা বিষু-র দুই পাদই অবলোকন করতে পারে এবং ধারণা করতে পারে। তৃতীয় পাদ মানুষেরা ধারণা করতে পারে না, এমনকি উড্ডীয়মান পক্ষীরাও

প্রাপ্ত হইতে পারে না।' অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্যকে নিরীক্ষণ করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং পাখীদের পক্ষেও তার কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব। একই সূক্তের পরবর্তী ৬নং ঋকে বলা হয়েছে যে "বিষ্ণু চারটি নব্বই দিনকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেন।' এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে বৈদিক যুগে প্রচলিত চার ঋতুর নিয়ন্তা হিসেবে সূর্যের কথা এখানে বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের ১/১৫৪/৪-৬, ১/১৫৫/৪, ১০/৩৭ নং সুক্তে বিষু- এবং সূর্য উভয়কেই জ্যোতির উৎস, অন্ন উৎপাদক, জগতের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সূর্য, বিষু-, সবিতা একই দেবতা, অশ্বীদ্বয় তাদের রথের ঘোড়া। আর ঊষা এবং রাত্রি এই দুই দেবী সূর্য অথবা বিষু-র গতি দ্বারাই সৃষ্ট। প্রাচীনকালে বড় বড় প্রাকৃতিক সত্তাগুলির বিভিন্ন নাম দেয়া হত; কিন্তু এসব বিভিন্ন নাম একই সত্তাকে নির্দেশ করতো। সূর্যের বিভিন্ন নাম সম্বন্ধে ঋগ্বেদ-এর প্রথম মন্ডলের ৬৪ নং সুক্তের ৪৬ং ঋক-এ বলা হয়েছে : "এই আদিত্যকে জ্ঞানীগণ ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট এবং সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও বিপ্রগণ একে বহু নামে অগ্নি, যম ও মাতারিশ্বা বলে থাকেন (একং সদ্বিপা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতারিশ্বানামাহঃ)।" এই সূর্য এবং বিষু-কে ঋগ্বেদ-এ দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র সৃষ্টির ধারক ও বাহক বলে মনে করা হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঋগ্বেদ-এর প্রথম মন্ডলের ১৪৫নং সুক্তের ৪ং ঋকে বিষু- সম্পর্কে বলা আছে "য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমূত দ্যামেকো দাধার ভুবানি বিশ্বাঃ।" মনে রাখা দরকার সূর্যের ত্রিপাদ বিক্ষেপের রূপক থেকেই সম্ভবত পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে ত্রিপাদে বিশ্বভুবন অধিকার এবং বলি দমনের পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়েছিলো। ঋগ্বেদ-এর ১০/১/১-৩ নং ঋকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অগ্নি, সূর্য, বিষু- একই দেবতা। দশম মন্ডলের প্রথম সুক্তের প্রথম ঋকে অগ্নি ও সূর্য অভিন্ন করে বলা হয়েছে "ভোর হতে না হতে বৃহৎ এবং সৌন্ধর্যময় অগ্নি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আলোকজ্বল মুর্তি ধারণ করলেন এবং উজ্জ্বল রশ্মি দিয়ে সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করলেন।" পরবর্তী ২য় ঋকে এই অগ্নিরূপী সূর্যকে "আশ্চর্য বালক" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এবং এরপরবর্তী ৩য় ঋকে স্পষ্ট করে ঘোষনা করা হয়েছে যে, এই অগ্নিই বিষু-, কারণ তিনি চারিদিকে ব্যাপ্ত। ১০/৩/১-২ নং ঋকে আবার একইভাবে সূর্যকে অগ্নিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১০/৫/৭নং ঋকে আবার বলা হয়েছে যে, অগ্নিই সূর্যরূপে ঊর্দ্ধাকাশে অবস্থান করছেন। সামবেদ সংহিতা (১৭/১/১/১৬২৫-২৬)-তেও বলা হয়েছে "হে বিষু-! এই যে তুমি বললে আমি বালরশ্মি দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই কি তোমার একমাত্র রূপ? তুমি সংগ্রামের (আপাত ক্রুদ্ধ অবস্থায় মধ্যদিনে) অন্যরূপ ধারণ করে থাকি; আমাদের কাছে তোমার সেই অন্যরূপ প্রকাশিত কর। .....আমি অতি ক্ষুদ্র, আর তুমি এই অন্তরীক্ষ লোকের অতি দূরে নিবাসকারী। সেই মহান তোমাকে আমি স্তব করছি।" আবার সামবেদ সংহিতায় (১৮/২/৫/১৬৭০-৭৪)-বলা হয়েছে "বিষু- এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন। এঁর পদ সুদৃঢ়রূপে অন্তরীক্ষে স্থাপিত ইনি তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন। বিষু-গোপা অন্তরীক্ষে অবস্থান করে তিন পাদের দ্বারা পৃথিবী পরিক্রমা করেন। এবং সকল ধর্মকে ধারণ করেন। .... যখন বিষু- পৃথিবীর সর্বত্র পরিক্রমা করেন, তখন রশ্মি রূপে দেবগণ আমাদের জন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।" এছাড়াও শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা (২/২৪-২৬, ৩/৬, ৪/২৯-৩০, ৫/১৪-১৫, ৫/১৪-১৫, ৫/৩৭, ৫৪১, ৯/৩১, ৭/১৬)-য় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সূর্য ও বিষু-র অভিন্নতার তত্ত্ব বারবার উল্লেখিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪/১/১/১৫-১৬)-এ বলা হয়েছে "যজ্ঞের ফল বিষু- প্রথম পেয়েছিলেন, তাই তিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি বিষু-, তিনি যজ্ঞ, তিনিই আদিত্য।" (**মৌলবাদ ও মহাকাব্য**; পৃষ্ঠা: ১২৯-১৩৩)

তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, সূর্য উপাসনা ছিল বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো এদেশের তৎকালীন লোকেরা উপলব্ধি করেছিল যে, আকাশের সূর্যই পৃথিবীতে আলোকের, প্রাণের এবং অন্নের উৎস। অতএব এই শক্তিমান সূর্যকেই ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা (পুরোহিত শ্রেণির লোক) শ্রেষ্ঠ দেবতা জ্ঞান করে যজ্ঞের মাধ্যমে নিরন্তর স্তুতি করতেন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উপহার দিতেন, নিজেদের

সামূহিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য তার কাছে প্রার্থনা জানাতেন। এবং পরবর্তীতে তাকে নিয়ে কাহিনী ফাঁদতেন। যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি নামধারী নানা লোকের ওপর অবতারত্ব আরোপে। আজকের আধুনিকযুগে আমরা জানি, আমাদের এই সৌরজগতে সূর্য হচ্ছে কতিপয় গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি নক্ষত্র মাত্র। সূর্যের ভেতরের মূল রাসায়নিক পদার্থসমূহ হচ্ছে, হাইড্রোজেন- ৯২.১%, হিলিয়াম-৭.৮%, অক্সিজেন-০.০৬১%, কার্বন-০.০৩০%, নাইট্রোজেন-০.০০৮৪%, নিয়ন-০.০০৭৬%, লৌহ-০.০০৩৭%, সিলিকন-০.০০৩১%, ম্যাগনেসিয়াম-০.০০২৪%, সালফার-০.০০১৫% এবং অন্যান্য-০.০০১৫%। সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন গ্যাস ৫৯৬ মিলিয়ন টন হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে আর বাকি ৪ মিলিয়ন টন শক্তিতে পরিণত হচ্ছে যা আমরা আলো হিসেবে অবলোকন করে থাকি। সূর্যের ভিতরের এই বিপুল পরিমান শক্তির উদগিরণের ফলে সূর্যেরপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪০,০০০ ওয়াট আলোক শক্তি নিঃসৃত হয়। যদিও এই মহাবিশ্বে সূর্য ই একমাত্র বড় বা আলোক উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, সূর্যের থেকে হাজারগুন বড় এবং আলোকউজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গ্যাসীয় পিন্ডের একটি পদার্থ কী করে আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষরূপে জন্ম গ্রহন করতে পারে? যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের পক্ষে সাফাই গাইতে পারে? ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপ্তি কতটুকু পল্লবিত হলে এই রকম কল্পনা করা সম্ভব? যাই হোক, প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হয়নি বলেই তারা এই ধরনের ভ্রান্ত জ্ঞানের শিকার হয়েছিলেন, এই ক্ষেত্রে তাদের কোন দোষ দেখছি না। হয়তো সেই সময়, আমরাও এরকম ভ্রান্ত জ্ঞানের শিকার হতাম। কিন্তু আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিপুল সংখ্যক হিন্দুধর্মালম্বীরা (এর মধ্যে ডিগ্রিধারী জ্ঞানীগুনী, রথীমহারথী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, আমলা থেকে শুরু করে রাস্তার ভিক্ষুক পর্যন্ত রয়েছেন) যখন কৃষ-কে বিষু-র (সূর্যের) অবতার বলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেন, মন্দিরে গিয়ে পুঁজো দেন, মথুরায় মসজিদ ভেঙ্গে কৃষে-র মন্দির বানানোর জন্য জান কোরবান করতে রাজি থাকেন, রাস্তায় গলা ফাটিয়ে অন্ধ আবেগে মৌলবাদী স্লোগান দেন, তখন তাদেরকে কি বলা যায়? জ্ঞানপাপী, সুবিধাবাদী, সাম্প্রদায়িক, ভন্ড না অন্য কিছু?

গীতায় শ্রীভগবানের উবাচ :- আমরা জানি বৈদিকযুগে সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজ চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে (১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয় (৩) বৈশ্য (৪) শুদ্র। এই সমাজ কাঠামোর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা শাষন ক্ষমতা ভোগ করত। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছিল বৈশ্য ও শুদ্ররা। আর তাঁদের পিঠে চড়েই পরগাছা আর্য শ্রেণী চিরকালই ভোগবিলাসে জীবন কাটিয়েছে। ভয়ংকর এই চাতুর্বর্ণ প্রথা কীভাবে সমাজে শুদ্র শ্রেণীদের নির্যাতন চালিয়েছিল তার কিছু নমুনা কয়েকটি হিন্দু উপাসনাধর্ম থেকে তুলে ধরছি -

(১) শুদ্রকে ইচ্ছা করলে উচ্চবর্ণীয়রা তাঁর বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে, বাধা দিলে হত্যা করার বিধান ছিল (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭.৩৫.৩)

(২) যজ্ঞকালে শুদ্ররা নিষিদ্ধ ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩.১.১.৯) এবং সারমেয় (কুকুর) ও শুদ্রকে অশুচি বলে বিহিত করা হতো (শতপত ব্রাহ্মণ, ১৪.১.১.৩১)।

(৩) শুদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র পঠন তো দূরের কথা শ্রবণও নিষিদ্ধ ছিল (গৌতম ধর্মসুত্র, ১৬,১৯) এবং শূদ্র ব্রাহ্মণকে মারলে তাঁর হাত পা কেটে ফেলা হতো; পক্ষান্তরে উল্টোটা ঘটলে ব্রাহ্মণকে দোষী বলে গণ্যই করা হতো না। (ঐ, ১২.১.১০)।

(৪) শুদ্রকে "চলমান শ্মশান" বলে অশুচি জ্ঞানে ঘৃণার্হ করে রাখা হতো (বশিষ্টসূত্র, ১৮.১১)।

(৫) শ্রদ্র ব্রাহ্মণপত্নীগমন করলে শাস্তি ছিল মৃত্যু (মনুস্মৃতি, ৮.৩৬৬); পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীকে বলৎকার করলেও শাস্তি ছিল অর্থদন্ড মাত্র (ঐ, ৮.৩৮৫)।

(৬) শুদ্র যদি বিপন্ন হয়েও উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে কথা বলেন, কিংবা তাঁর মুখের দিকে তাকান, তাহলে শাস্তি ছিল জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা (গৌতম ধর্মসুত্র, ২.২.৩.৩৩)।

(৭) শূদ্র দাসরা উচবর্ণীয়দের ফেলে দেওয়া জীর্ন পোশাক এবং জুতো, ছাতা এবং মাদুরই ব্যবহার করতে অধিকারী হবে, নতুন বা আস্ত কোনো কিছু তারা ব্যবহার করতে পারবেন না (গৌতম ধর্মসুত্র, ১০.৫৮)।

(৮) যে কোন শুদ্রা নারীকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পুরুষ "ভোগার্থে" রক্ষিতা রূপে (স্ত্রীরূপে নয়) পোষন করতে চাইলে তিনি নির্দ্ধিধায় এবং নির্বাধে সেটি করতে পারবেন। (বশিষ্ট ধর্মসুত্র, ১৮.১৮)।

(৯) ব্রাহ্মণ যদি শুদ্রাণীকে ভোগ করেন, তাহলে পরবর্তীকালে তিনি সেই 'পাপকৃত্য' থেকে রেহাই পেতে পারেন 'শুদ্ধিকৃত্য' নিষ্পন্ন করলে (আপস্তম্ব ধর্মসুত্র, ১.৯.২৬.৭ এবং বৌধায়ন ধর্মসুত্র, ৪.২.১৩)।

(১০) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঘটনাচক্রে কোন নিরাপরাধ শুদ্র বা দাসকে বধ করলে তাঁকে যে প্রায়শ্চিত করতে হতো, ঠিক সেই কই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত ছিল কুকুর, পেঁচা, কাক, ব্যা- ভাম প্রভৃতি প্রাণীকে বধ করার ক্ষেত্রেও (আপস্তম্ব ধর্মসুত্র, ১.৯.২৫.১৩ এবং বৌধায়ন ধর্মসুত্র, ১.১০.১৯.৬)।

(১১) ব্রাহ্মণ যদি কোনো শুদ্রানীকে বৈধভাবে স্ত্রীহিসেবে গ্রহন করেন্ন তাহলেও সেই মহিলার গর্ভজ সন্তান পিতৃসম্পত্তির অংশ পাবে না। শুধুমাত্র তার ভরণপোষনের খরচটুকু দেবে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা, যারা উচ্চবর্ণীয় নারীর গর্ভজাত (গৌতম ধর্মসুত্র ২৮.৩৭)।

(১২) সমপরিমাণ অর্থঋণ হিসেবে গ্রহন করলে, ব্রাহ্মণ দেয় সুদ ২%, ক্ষত্রিয় দেয় ৩%, বৈশ্য দেয় ৪%, শুদ্র ৫% (মনুস্মৃতি, ৮.১৪২)।

(১৩) কোন দাস তাঁর প্রভুর অন্যায় বা অনাচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে অধিকারী ছলেন না (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ৩.১)।

সম্ভবত আর উদাহরণ অণ্বেষণ নিষ্প্রয়োজন! এই তালিকা, ভাসমান "সামাজিক" হিমশৈলের শীর্ষাংশ মাত্র! এই রকমের শতশত বিধান প্রাচীন ভারতের সমাজজীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিলো।এই সকল তথাকথিত উপাসনাধর্ম্বিধানের দোহাই পেড়ে সমাজের বৃহত্তমসংখ্যক মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য মানবিক অধিকার (মর্যাদা তো পরের কথা!) থেকেও বঞ্চিত করার পরিণামে এঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্মের ধরে অবমানিত এবং লাঞ্চিত হয়েছেন! কিন্তু যখন এই সকল অপহ্নবকের পক্ষে সাফাই গেয়ে, বর্ণভেদ প্রথার গুরুতর আর্থসামাজিক অসাম্যকে ঐশ্বরীয় সমর্থন দেবার উদ্দেশ্যে যখন গীতায় শ্রীভগবান (**ভগবদ্গীতা- ৪/১৩**) বলে উঠেন-

চাতুর্বর্ণ্যয়ং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারম্পি মাং বিধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥

অর্থ :- গুন অনুযায়ী কর্মের বিভাগ অনুসারে আমা দ্বারা চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে তার কর্তা এবং অব্যয় অকর্তা রূপে জানবে।

তিনি আরোও বলেন (**ভগবদ্‌গীতা- ১৪/১৮**) -

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥
অর্থ :- সত্ত্বগুণের অধিকারীরা ঊর্ধ্বে যায়, রজ গুণসম্পন্নরা মধ্যে অবস্থান করে, আর তম গুণসম্পন্ন লোকেরা জঘন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে অধোগামী হয়।

এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, যে এই উক্তির মাধ্যমে আর্যসমাজ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোয় ব্রাহ্মণ্যদের উচ্চস্থান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যস্থান আর শুদ্রদের নিম্নস্থানেরই ইংগিত করা হচ্ছে।

আবার শ্রীভগবান বলেন (১৭/২০) -

যাতযামং গতরসং পূর্তি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥
অর্থ :- বাসী রসশূন্য, দুর্গন্ধযুক্ত, আগের দিন রান্না করা, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্য তমগুন সম্পন্ন লোকের প্রিয়।

সর্বজ্ঞ ভগবান (!) কী জানেন না যে, এরকম খাবার তথাকথিত তামস প্রকৃতির শুদ্রলোকেরা ভালোবেসে খায় না। বাসী, নিরস, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাবার তাঁরা দারিদ্রের পীড়নে খেতে বাধ্য হয়েছে। অথচ শ্রীভগবান (!) নিকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণকেই শুদ্রদের স্বভাবজ তমগুণের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এতে সহজেই বোঝা যায়, অমানবিক আর্থসামাজিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই কুখ্যাত চাতুর্বর্ণ প্রথাটি শ্রীভগবানের মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বলিয়েছেন। শ্রীভগবানের দোহাই দিয়ে, উপাসনাধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি করে, দারিদ্র, ক্লিষ্ট, অনাহারী মানুষেরা (শুদ্ররা) যেন তাঁদের (ব্রাহ্মণ্যদের) ক্ষমতার প্রতি অফুরন্ত লিপ্সা মিটিয়ে চলে বিনা প্রশ্নে, বিনা বাঁধায়।

গীতা সম্পর্কে যে প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো এটি মহাভারতে-এ কী কারণে সংযোজিত করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর খুব সুন্দর করে দিয়েছেন স্বাধীন চিন্তাবিদ, বিদগ্ধ লেখক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় (**মৌলবাদ ও মহাকাব্য**; পৃষ্ঠা: ৩৬)। তিনি বলেছেন,"গীতা রচনার এবং তাকে মহাভারতে বসিয়ে দেবার একটা ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রয়োজন ছিল। যে সময়ে গীতা রচিত হয়েছিল, তখন ছিল হিন্দুধর্মের জন্য দুঃসময়। বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক প্রসার হিন্দুধর্মকে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। বৌদ্ধধর্মের এই সফল চ্যালেঞ্জের মূলে ছিল একদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং আচার-অনুষ্ঠানের শীলীভূত ঐতিহ্য আর অর্থহীন আতিশয্য, আর অন্যদিকে বংশানুক্রমিক বর্ণভেদজনিত অমানবিকতা আর সামাজিক অবক্ষয়। এই দুই বাধাকে উত্তরণ করে এক নূতন অবতারতত্ত্ব এবং ভক্তিবাদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা এবং হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটানোই ছিল গীতার প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্ণবাদ এবং নারী ও শূদ্রের হীনস্থানের তত্ত্বের সংগে বৌদ্ধ ধর্মের বাসনা ত্যাগ এবং স্থিতপ্রজ্ঞ প্রভৃতি কয়েকটি তত্ত্ব সংযুক্ত হয়েছিল। তাছাড়া ঐ সময়ে জৈনধর্ম, অজীবক ধর্ম প্রভৃতি

অন্যান্য ধর্মও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। চার্বাকপন্থী লোকায়ত নাস্তিকতাবাদ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পরপর উত্তরপশ্চিম থেকে বহিরাক্রমণ এবং বিদেশীদের আর্যাবর্তে বসতিস্থাপনের ফলে তথাকথিত ম্লেচ্ছ ও যবনেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অগ্রাহ্য করত। আর পর্বতবাসী কিরাত ও অরণ্যবাসী নিষাদ ও শবরেরা চিরকালই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এই অবস্থায় সুংগ রাজত্ব থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত রাজশক্তির সহায়তায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক ব্যাপক উদ্যোগ আরম্ভ হয়। ভগবদ্‌গীতা তারই অন্যতম ফলশ্রুতি।"

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ভগবদ্‌গীতা ব্রাহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব ক্ষমতা কাঠামো, শাসন-শোষন, চাতুর্বর্ণ প্রথা টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যদের সুদীর্ঘ সময় ধরে সুকৌশলে রচিত। এটি কোনভাবেই কোন দেবতার মুখঃনিসৃত বাণী নয়। স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্বই যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ। গীতা কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়; নয় কোন আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। হতে পারে, সাহিত্য হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, কিন্তু মানব কল্যানের জন্য, বিজ্ঞানের প্রসারে, জ্ঞানের বিকাশে এঁর বিন্দু মাত্র কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু এখন যখন কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন যখন **ভগবদ্‌গীতাকে** আদর্শ হিসেবে রেখে সাম্য, মৈত্রী, ভাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টির কথা বলেন, বিজ্ঞানের বিকাশে গীতার অবদানের কথা বলেন, তখন প্রশ্ন আসে মনে, কী ধরণের ভাতৃত্বের বন্ধন কামনা করেন তাঁরা? বিজ্ঞান বলতে কী বোঝেন তাঁরা?

মুক্তমনা'র পঞ্চবার্ষীকিতে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয়তু মুক্তমনা।

তথ্যসূত্র :-

(১) জয়ন্তানুজ বন্ধ্যোপাধ্যায় ; সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা; এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭২।

(২) জয়ন্তানুজ বন্ধ্যোপাধ্যায় ; মহাকাব্য ও মৌলবাদ; এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭২।

(৩) ড. আর. এম. দেবনাথ ; সিন্ধু থেকে হিন্দু; রিডার্স ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

(৪) ভবানীপ্রসাদ সাহু ; ধর্মের উৎস সন্ধানে; উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা-৭০০০০৭।

(৫) পল্লব সেনগুপ্ত ; ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা উৎসের সন্ধানে; সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা-৭০০০৩৪।

(৬) http://www.iskcon.com/worldwide/centres/asia.html

(৭) www.solarviews.com/eng/sun.htm এবং http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_5.html

- - - - - - - - -

যোগাযোগ : **ananta_atheist@yahoo.com**